banglabook.com

দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে তাঁর শরীরের সাথে বাঁধা। ঝোলা থেকে নানারকম জিনিস বের হয়ে আছে, তলায় ছোট ছোট চাকা, মনে হল উপরে স্টিয়ারিং হুইলের মতো কী একটা আছে, প্রয়োজনে জিনিসটা ছোট একটা গাড়িতে পাল্টে গেলেও আমি অবাক হব না। সফদর আলীর মাথায় একটা বারান্দাওয়ালা টুপি। টুপির উপরে একটা বাতি, আপাতত সেটা নেভানো আছে। টুপি থেকে দুটি হেডফোনের মতো জিনিস নেমে এসেছে। টুপির উপরে রেডিওর অ্যান্টেনার মতো কী–একটা জিনিস বেরিয়ে আছে। তাঁর পরনে খাকি শার্ট আর গাঢ় নীল রঙের একটা প্যান্ট। শার্ট আর প্যান্টে সঠিক পকেটের সংখ্যা বলা মুশকিল। বাইরে থেকে অনুমান করি পঞ্চাশ থেকে সত্তরের ভেতরে হবে। তাঁর গলায় তাবিজের মতো কী একটা ঝুলছে। সেটা যদি তাঁর বিখ্যাত ভূতটিপি হয়, আমি অবাক হব না। তাঁর ডান হাতে লাঠির মতো একটা জিনিস, হাতের কাছে অসংখ্য সুইচ দেখে বুঝতে পারি এটি সাধারণ লাঠি নয়।

বলাই বাহুল্য, সফদর আলীকে ঘিরে একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেল। তিনি সেটাকে গ্রাহ্য না করে বললেন, চলুন প্ল্যাটফরমে যাই।

চলুন—আমি তাঁর মতো লোকজনের কৌতূহলের বিষয় হয়ে অভ্যস্ত নই, তাই তাড়াতাড়ি তাঁর পিছু পিছু সরে পড়ার চেষ্টা করি। সৌভাগ্যবশত প্ল্যাটফরমে এক জন আধপাগল গোছের লোক তার রসগোল্লায় মিষ্টি কম ছিল দাবি করে এক জন মিষ্টির দোকানির সাথে এমন হৈচৈ করে ঝগড়া শুরু করেছে যে কৌতূহলী দর্শকের ভিড়টা আমাদেরকে ঘিরে তৈরি না হয়ে তাদের দিকে সরে গেল। আমি গলা নামিয়ে বললাম, সবকিছু এনেছেন তো?

হ্যাঁ। কানের হেডফোনটা দেখিয়ে বললেন, সময়টা খারাপ, তাই এটা তৈরি করে নিলাম।

কী এটা?

আবহাওয়া অফিস। সরাসরি স্যাটালাইটের সাথে যোগাযোগ। ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি সুবিধের নয়, একটু ডিস্টরশান হয়।

আমি কিছু না বুঝে বললাম, ও।

কিছুক্ষণের মাঝেই ট্রেন লাগিয়ে দিল। আমরা উঠে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বসি। ট্রেনে বেশ ভিড়। ঘুমাতে পারব কি না সন্দেহ আছে, কিন্তু এক রাতের ব্যাপার, আমরা বেশি মাথা ঘামালাম না।

কক্সবাজার পৌঁছলাম পরদিন প্রায় বিকেলের দিকে। রাতে ভালো ঘুম হয় নি, সারা দিন বাসের ঝাঁকুনি। কিন্তু সে হিসেবে বেশ ঝরঝরে আছি, মনে হয় সকালে সফদর আলী যে দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছিলেন তার ফল। কালোমতন বিদঘুটে ট্যাবলেট, ভেতরে কী ছিল কে জানে! বাসে আমাদের পাশে দু' জন কলেজের ছেলে বসেছিল। তাদের কাছে শুনলাম কক্সবাজার পার হয়ে আরো পাঁচ ছয় মাইল গেলে নাকি চমৎকার নিরিবিলি এলাকা। একটা নাকি চমৎকার থাকার জায়গা আছে। ছেলে দু'টি আমাদের জায়গাটার নাম, কী ভাবে যেতে হয় গুছিয়ে বলে দিল। আমার নিজের এত বেশি নিরিবিলিতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সফদর আলীর খুব উৎসাহ। লোকজনের ভিড় তাঁর ভালো লাগে না, তিনি যেভাবে চলাফেরা করেন, সবসময়েই তাঁকে ঘিরে একটা ছোটখাট ভিড় জমে ওঠে, তিনি যে নিরিবিলিতে থাকতে চাইবেন

banglabook.com

এতে অবাক হবার কী আছে?

খুঁজে খুঁজে আমরা যখন ঠিক জায়গায় হাজির হলাম, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। শুক্লপক্ষের রাত, চমৎকার চাঁদ উঠেছে। সমুদ্রে তার প্রতিফলন দেখে মাথা খারাপ হয়ে যায়, সফদর আলীর মতো এরকম কট্টর বিজ্ঞানী মানুষ পর্যন্ত খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, কী চমৎকার লাগছে! দেখেছেন কেমন কোমল একটা ভাব?

আমি মাথা নাড়লাম।

আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? চাঁদের আলোতে রং বোঝা যায় না। আমাদের চোখের রেটিনাতে তখন শুধু রডগুলো কাজ করে। রডগুলো রং ধরতে পারে না, তাই কনট্রাস্ট কমে যায়, মনে হয় খুব কোমল।

জিনিসটি বুঝিয়ে দেয়ার পরও আমার কিন্তু ভালোই লাগে।

আমরা হোটেলের দরজা খুলে ভেতরে এসে ঢুকি। আমাদের শব্দ শুনে মাঝবয়সী এক জন লোক বেরিয়ে আসেন। ভদ্রলোকের পোশাক দেখার মতো, শৌখিন মানুষের হাতে পয়সা হলে যা হয়। চকচকে কাপড়–জামা তো আছেই, তার উপর হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে মোটা মোটা আংটি, গলায় সোনার চেন। ভদ্রলোক আমাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন, আমি বললাম, আপনাদের ঘর খালি আছে? সপ্তাহ দুয়েক থাকার মতো?

দু' সপ্তাহ? ভদ্রলোক খুশি না হয়ে মনে হল একটু শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

জ্বি।

আছে ঘর কয়েকটা। কাউন্টার থেকে কাগজপত্র বের করতে করতে বললেন, কোথা থেকে আসছেন?

ঢাকা।

প্লেনে এলেন?

না, ট্রেন আর বাস।

ও! তাহলে তো আপনাদের অনেক ধকল গেছে। ঠিক আছে, আগে আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই, দু'জনের জন্যে ভালো একটা ঘর আছে। নাম লেখালেখি করার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক কাউন্টার থেকে চাবি বের করে এগিয়ে যান, আমরা পিছু পিছু যেতে থাকি।

ঘর দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। চমৎকার ঝকঝকে ঘর। দু'পাশে দু'টি সুদৃশ্য বিছানা, জানালার পর্দা টেনে দিলে সমুদ্র দেখা যায়। ঘরের সাথে বাথরুম, সামনে বারান্দা। ভেতরে টেবিল, টেবিলে সুদৃশ্য কাচের জগে পানি। এত আয়োজনের তুলনায় ঘরভাড়া খুব কম, আমি অবাক না হয়ে পারি না। ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে জানলাম তিনিই হোটেলের মালিক, নিজেই দেখাশোনা করেন। আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই। একা একা নিরিবিলি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান। আমাদের গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন, যাওয়ার আগে বলে গেলেন কোথায় আমরা খেতে পারব, এখান থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা নাকি ভালো রেস্তরাঁ আছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দু'জনে অনেক সময় নিয়ে গোসল করে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে বের হলাম। চাঁদের আলোতে সমুদ্রের তীর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মনটা অকারণেই খুশি হয়ে ওঠে। খুঁজে খুঁজে রেস্তরাঁটি বের করে খেয়ে নিলাম দু'জনে। খুব

উঁচুদরের খাবার, সেরকম দাবি করব না, এ অঞ্চলের মানুষেরা বোধহয় ঝাল একটু বেশিই খায়। সফদর আলীর পকেটে "ঝালধ্বংস" ট্যাবলেটটা না থাকলে খেতে পারতাম কি না সন্দেহ। একটা ছোট ট্যাবলেট মাছের ঝোলে ছেড়ে দিতেই সে সব ঝাল শুষে নিল, সত্যি বলতে কি, স্বাদও খানিকটা শুষে নিয়ে স্বাদটা কেমন জানি পানসে করে দিল। পেটে খিদে ছিল, তাই খেতে বিশেষ অসুবিধে হয় নি।

খেয়ে বের হয়েছি, একটু হাঁটতেই মনে হল যেন একটা মাছের বাজার। মাছের আঁশটে গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। বেশ রাত হয়েছে, কিন্তু অনেক লোকজন। খাওয়ার ঠিক পরপরই এরকম আঁশটে গন্ধ ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু সফদর আলী গোঁ ধরলেন তিনি বাজারটা দেখবেন। সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনা হয়েছে, বড় বড় কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে পাইকারি বেচাকেনা হচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব মাছ, দেখে তাক লেগে যায়। ভিড়ে এক জায়গায় মাঝারি একটা হাঙরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, সফদর আলী হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, সাবধান!

কী হল?

এক জন লোক অনেকক্ষণ থেকে আমাদের পিছু পিছু ঘুরছে।

সফদর আলী আগেও অনেক বার দাবি করেছেন, তাঁকে নাকি সি. আই. এ. এবং কে. জি. বি.-র লোকেরা অনুসরণ করে বেড়ায়, কখনো বিশ্বাস করি নি। এবারেও আমি কথাটা হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সফদর সাহেব ভুরু কুঁচকে চিন্তিত মুখে গোঁফ টানতে লাগলেন। আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, কোন লোকটা?

আসেন, দেখাচ্ছি।

বাজার থেকে বের হয়ে একটু হেঁটে এগিয়ে যেতেই দেখি সত্যি তাই। আমরা একটু এগুতেই একটা লোক এগোয়, আমরা দাঁড়াতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে কালঘাম ছুটে যাবার মতো অবস্থা। কী করব বুঝতে পারছিলাম না, বাজারে ভিড়ের মধ্যেই ভালো ছিলাম, রাস্তাটা এদিকে আবার বেশ নির্জন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাজারে ফিরে যাব কি না ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি লোকটার হাতে একটা টর্চলাইট জ্বলে উঠল, আলো ফেলে ফেলে লোকটা এগিয়ে আসতে থাকে সোজা আমার দিকে। কাছে এসে আমার মুখে আলোটা ফেলে মেঘস্বরে বলল, দাঁড়ান এখানে।

ভয়ে আমার কাপড় জামা-নষ্ট হবার অবস্থা, তোতলাতে তোতলাতে কোনোমতে বললাম, আমি?

আমার ধারণা ছিল লোকটা নিশ্চয়ই আমাকে সফদর আলী বলে ভুল করেছে; কিন্তু দেখা গেল তা নয়। লোকটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কালো কুচকুচে পিস্তল বের করে আনে, আমার দিকে তাক করে বলে, হ্যাঁ, আপনি। একটা টুঁ শব্দ করলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে ঘিলু বের করে দেব।

আমি মাথা ঘুরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম, তার মাঝে দেখি সফদর আলী পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী একটা জিনিস বের করে লোকটার দিকে তাক করেছেন। কিছু বোঝার আগেই তিনি হঠাৎ সুইচ টিপে দিলেন। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা নীল আলো বের হল। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম, লোকটা আর্তনাদ করে দশ হাত

দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। হাত থেকে টর্চ আর পিস্তল ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। তার মাঝে সফদর আলী দৌড়ে লোকটার বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলছেন, একটু নড়বে না, নড়লেই আরেকটা দেব, ডাবল করে দেব পাওয়া—

আমি বললাম, কথা বলছেন কি? আরেকটা দিয়ে দিন আগে, নড়ছে যে এখনো।

লোকটার নড়ার আর কোনো ইচ্ছা নেই, কাতর স্বরে বলল, ইকবাল, আমাকে বাঁচা। আমি মতিন, ঠাকুরপাড়ার মতিন।

আমার সম্বিত ফিরে আসে, দৌড়ে টর্চলাইটটা তুলে লোকটার দিকে এগিয়ে যাই, সত্যিই মতিন, চোখে আলো ফেলে আমার চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছিল বলে দেখতে পাই নি, না হয় মতিনকে না চেনার কোনো কারণ নেই, ও আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমার মুখে কথা সরে না, তোতলাতে তোতলাতে বলি, তু-তু-তু-তুই—

সফদর আলী ততক্ষণে মতিনের বুক থেকে পা সরিয়ে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন। সে উঠে হাতড়ে-হাতড়ে পিস্তলটা তুলে নেয়, বার কয়েক লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, বাজারে দেখলাম তোকে। ভাবলাম, তুই যেরকম ভীতু, একটু মজা করি তোর সাথে। সর্বনাশ—আরেকটু হলে তো মরেই গিয়েছিলাম!

আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম, ইনি সফদর আলী, আমার বন্ধু।

মতিন তখনো হাঁপাচ্ছে, কোনোমতে বলল, খালি গল্প শুনেছিলাম স্টান্টগানের, আজ দেখলাম।

স্টান্টগান?

হ্যাঁ, যেটা দিয়ে মারলেন আমাকে।

ও! সফদর আলী পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট হাতলওয়ালা জিনিসটা বের করলেন, এটাকে স্টান্টগান বলে নাকি? জানতাম না তো!

জানতেন না মানে? মতিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, লাইসেন্স করান নি?

লাইসেন্স?

বন্দুক লাইসেন্স করাতে হয় জানেন না? কে বিক্রি করেছে আপনাকে?

আমাকে কেউ বিক্রি করে নি, আমি নিজেই তৈরি করেছি।

মতিন খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সফদর আলীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি বললাম, সফদর আলী হচ্ছেন বিজ্ঞানী মানুষ, অনেক কিছু ইনি তৈরি করেছেন।

সফদর আলী বিরস মুখে স্টান্টগানটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, খানিকক্ষণ পর আস্তে-আস্তে বললেন, জন্ম নিতে-নিতে একটু দেরি হয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

একটু ঝাঁজিয়ে উত্তর দিলেন, দেখছেন না, যেটাই তৈরি করি সেটাই আগে আবিষ্কার হয়ে গেছে! বাকি আছে কী?

মতিন কী একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, কাছাকাছি কোনো বাথরুম আছে? তুই যখন বন্দুকটা ধরলি, ভয়ে পেটটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল, এখন মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ, আছে। ঐ তো ওদিকে—হঠাৎ করে পেট খারাপ নাকি?

সফদর আলী বললেন, নার্ভাস ডাইরিয়া। ভয় পেলে হয়, হঠাৎ করে

banglabook.com

ইনটেস্টাইনে—

ব্যাখ্যাটা শোনার সময় ছিল না, মতিনের সাথে আমি দৌড়ালাম।

মতিন কী কাজ করে বলা মুশকিল। পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর ইন্টেলিজেন্সের লোক। পরিষ্কার করে কখনো বলে না, কে জানে হয়তো বলা নিষেধ। একসাথে দু'জন কলেজে গেছি, কিন্তু এখন দেখা হয় খুবই কম। খুব ব্যস্ত ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাকে এখানে দেখব কখনো চিন্তাও করি নি। কোথায় এসেছে, কী করছে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, প্রশ্নগুলো খুব কায়দা করে এড়িয়ে যায়। আমাদের দু'জনকে তার বাসায় নিয়ে এসেছে, কাছেই বাসা। আমাদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে মতিন খুটিয়ে খুটিয়ে সফদর আলীকে দেখে, একটু ভয়ে ভয়েই। এরকম একটা সংঘর্ষ দিয়ে পরিচয়, ভয় না করে উপায় কি? চেয়ার টেনে একটু দূরে বসে, সফদর আলী একটু ক্ষেপে তাকে আরেকটা শক্ দেন, সেই ভয়ে কি না কে জানে।

আমি ভয়টা ভাঙিয়ে দেয়ার জন্যে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন টেলিফোন বেজে ওঠে। মতিন ব্যস্ত হয়ে গিয়ে টেলিফোনটা ধরে, হ্যালো, কে? মজুমদার?

ওপাশ থেকে কী বলল কে জানে, মতিনের গলার স্বর হঠাৎ নেমে আসে। শোনা যায় না, এমন। গোপন জিনিস নিয়ে কথা হচ্ছে, চায় না আমরা শুনি। আমার একটু অস্বস্তি লাগতে থাকে। সফদর আলীর কথা ভিন্ন, মতিনের গলার স্বর নিচু হতেই তাঁর কান যেন খাড়া হয়ে ওঠে, তিনি গলা লম্বা করে ঘাড় বাঁকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে মতিনের কথা শোনার চেষ্টা করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে থাকেন, যেন সবকিছু বুঝে ফেলছেন। দেখে আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবার মতো অবস্থা।

মতিন কথা শেষ করে একটু অপরাধীর ভঙ্গি করে ফিরে এসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সফদর আলী বাধা দিয়ে বললেন, অবস্থা তাহলে সত্যিই খারাপ?

মতিন থতমত খেয়ে বলল, কিসের অবস্থা?

হেরোইন তৈরি। এখানেও তৈরি শুরু করেছে তাহলে?

মতিনের চোয়াল ঝুলে পড়ল, খানিকক্ষণ সে কোনো কথা বলতে পারে না। আবার যখন চেষ্টা করে তখন গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, আপনি—মানে আপনি কী ভাবে জানেন?

টেলিফোনে কথা বলছিলেন, তা-ই শুনছিলাম।

কিন্তু টেলিফোনে আমি তো কথা বলছিলাম না, শুনছিলাম।

একটা দুটো কথা তো বলছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায়। সফদর আলী গলার স্বর পাল্টে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা যত বার ওদের ল্যাবরেটরিতে হানা দেন তত বার ওরা পালিয়ে যায়?

মতিনের মাথায় মনে হয় বাজ পড়ল। সে ঘুরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে একটা চেয়ার ধরে সামলে নেয়। ঢোক গিলে বলল, কী বললেন?

যত বার বর্ডারে ওদের ল্যাবরেটরিতে হানা দেন তত বারই আগে খবর পেয়ে পালিয়ে যায়?

মতিনের মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়, অনেকক্ষণ লাগে ওর কথা বলতে। যখন বলে তখন গলার স্বর শুনে মনে হয় একটা ফাটা বাঁশের ভেতর দিয়ে কথা বলছে। তোতলাতে-তোতলাতে বলল, সা-সাঙ্ঘাতিক গোপন ব্যাপার এটা, সারা দেশে মাত্র দশ বার জন লোক জানে। বাইরের কিছু দেশ সাহায্য করছে খবরাখবর দিয়ে, কিন্তু আপনি কী ভাবে জানলেন?

সফদর আলীর মুখ খুশিতে হাসি হাসি হয়ে ওঠে, কেন ও তো খুবই সহজ। কথা বলতে বলতে আপনি একসময় বললেন, অ্যাসিড। অ্যাসিড কোথায় কাজে লাগে, হেরোইন তৈরি করতে। তার মানে এখানে কোথাও হেরোইন তৈরি হচ্ছে। এখন পপি ফুলের সময়, পপি ফুল থেকে হেরোইন তৈরি হয় এ তো সবাই জানে। মতিনের দিকে আর তাকানো যাচ্ছিল না। কী একটা বলতে যাচ্ছিল। সফদর আলী বাধা দিলেন। তারপর একসময় বললেন, "চিড়িয়া", পুরোটা শুনতে পাই নি, নিশ্চয়ই বলেছেন "চিড়িয়া উড় গিয়া", মানে পাখি উড়ে গেছে। তার মানে কী হতে পারে? অতি সহজ—আপনারা যখন ল্যাবরেটরিতে হানা দিয়েছেন সবাই আগে খবর পেয়ে পালিয়ে গেছে। বোঝা কঠিন কি?

মতিনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার একটু ভয় ভয় করতে থাকে, সে ফ্যাকাসে মুখে এক বার সফদর আলীর দিকে, এক বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল কেঁদে দেবে। কিন্তু কাঁদল না। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, হেরোইন ব্যাপারটা আপনি ঠিকই ধরেছেন।

সফদর আলী বললেন, বললাম না, খুবই সহজ ব্যাপার।

মতিন বলল, কিন্তু ধরেছেন একেবারে ভুল করে। আমি যখন "অ্যাসিড" কথাটা বলেছি, তখন আমার উপরওয়ালার অ্যাসিড অ্যাসিড মন্তব্যের কথা বলছিলাম। যখন চিড়িয়ার কথা বলেছি, তখন এক জন ইনফরমারের কথা বলছিলাম, সে হচ্ছে এক আজব চিড়িয়া।

এবারে সফদর আলীর চোয়াল ঝুলে পড়ে। অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে কী একটা বলতে গিয়ে তোতলাতে থাকেন। আমি কী করব বুঝতে না পেরে বোকার মতো হেসে উঠি, সে হাসি আর কিছুতেই থামাতে পারি না। আমার দেখাদেখি প্রথমে মতিন তারপর সফদর আলীও হাসতে শুরু করেন।

অনেকক্ষণ লাগে আমাদের হাসি থামাতে। তার ভেতর আবার চা এসে যায়। আমরা খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে নিই। মতিন পুরো ব্যাপারটিতে এত অবাক হয়েছে যে বলার নয়, সম্পূর্ণ ভুল জিনিসের উপর ভিত্তি করে কেউ যে এরকম পুরোপুরি একটা সত্যি জিনিস বের করে ফেলতে পারে, সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ব্যাপারটা আমরা যখন জেনেই গেছি তখন আর গোপন করে কী হবে। মতিন সবকিছু খুলে বলে, অবশ্যি আমাদের কথা দিতে হয় সেটা কাউকে বলব না। জিনিসটা জানাজানি হয়ে গেলে হেরোইন কারবারিদের আর ধরা যাবে না।

হেরোইন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মাদকদ্রব্যের একটা। খুব সহজেই মানুষ হেরোইনে আসক্ত হয়ে পড়ে। তখন নিয়মিত হেরোইন না নিয়ে উপায় থাকে না। পাশ্চাত্যে যত অপরাধ হয় তার বড় একটা কারণ হচ্ছে এই হেরোইন। পৃথিবীর নানা দেশে এটা তৈরি হয়, তারপর গোপনে পাঠানো হয় পাশ্চাত্যে। কোটি কোটি টাকার

ব্যবসা এই হেরোইন দিয়ে। আগে এটা বার্মায় তৈরি হত, সেখানে পুলিশের ধাক্কা খেয়ে এখন সীমান্ত পার হয়ে এদেশে চলে এসেছে। পাহাড়ের উপর গোপন ল্যাবরেটরিতে তৈরি হচ্ছে হেরোইন। সবচেয়ে মজা হচ্ছে, যত বার খবর পেয়ে ওদের ধরতে গিয়েছে, ওরা কী ভাবে কী ভাবে খবর পেয়ে পুরো ল্যাবরেটরি তুলে পালিয়ে গেছে। ল্যাবরেটরি অবশ্যি এমন কিছু জমকালো ব্যাপার নয়। ছোট ছোট বাসনপত্র, কেরোসিনের চুলো, কিছু কেমিক্যাল সরিয়ে নেয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। সবচেয়ে যেটা দুশ্চিন্তার বিষয় সেটা হচ্ছে প্রত্যেক বারই ওরা আগে কী ভাবে জানি খবর পেয়ে যায়। কেউ নিশ্চয়ই আগে থেকে খবর দিয়ে দেয়। কী ভাবে সেটা হয় কেউ বলতে পারছে না। অনেকে সন্দেহ করছে পুলিশে বোধহয় ওদের লোক আছে। ব্যাপারটা তাই বাড়াবাড়ি রকম গোপন।

সবকিছু শুনে সফদর আলী খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এরকম ব্যাপার তিনি আগে শোনেন নি। মতিনকে জিজ্ঞেস করলেন, ল্যাবরেটরিটা কতদূর এখান থেকে?

তিরিশ মাইলের মতো। প্রথম দশ মাইল রাস্তা আছে, জিপে যাওয়া যায়। বাকিটা হেঁটে যেতে হয়। অনেক সময় লাগে পৌঁছুতে।

তার মানে ওরা পালিয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট সময় পায়।

হ্যাঁ।

খবরটা নিশ্চয়ই ওয়্যারলেসে পায়।

নিশ্চয়ই, এর থেকে ভালো উপায় কি হতে পারে?

সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, ওদের কেউ যদি রাস্তার ওপর চোখ রাখে, তাহলে আপনারা যখন জিপে রওনা দেন, দেখেই তো বুঝে ফেলবে। সাথে সাথে ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে দেবে।

হ্যাঁ, আমরা তাই যখন জিপে রওনা দিই তখন চেষ্টা করি ওয়্যারলেসে কোনো কথাবার্তা, সংকেত ধরতে পারি কি না।

কী ভাবে করেন সেটা? সফদর আলী তার মনের মতো বিষয় পেয়ে প্রায় ডুবিয়ে দেন নিজেকে, কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে খোঁজেন?

মতিন মাথা চুলকে বলল, সেটাই হয়েছে মুশকিল। ফ্রিকোয়েন্সি তো একটা দু'টা নয়, অসংখ্য—একটা মস্ত বড় রেঞ্জ। এখানে এয়ারপোর্ট আছে, জাহাজের ফ্রিকোয়েন্সি আছে, পুলিশ আর্মির ফ্রিকোয়েন্সি আছে, আজকাল আবার স্যাটালাইট থেকে আসছে, পাবলিকের ফ্রিকোয়েন্সিতে তো হাতই দেয়া যায় না। কী ভাবে যে ঠিক ফ্রিকোয়েন্সিটা বেছে নেয়া যায়, সেটাই হচ্ছে মুশকিল।

সফদর আলী উৎসাহে আরো এগিয়ে আসেন, ঠিক যখন আপনারা রওনা দেন তখন যদি হঠাৎ করে কোনো সিগন্যাল পাঠানো হয় এই এলাকা থেকে—

মতিন মাথা নেড়ে বলল, সেটাই করতে চাচ্ছি। যদি সেই সিগন্যালটা শুনতে পাই, ধরতেও তো হবে। আমাদের কাছে ভালো যন্ত্রপাতি নেই, পাঠাতে লিখেছি হেড অফিসে, শুধু দেরি করছে।

সফদর আলীর চোখ চকচক করে ওঠে, আমার কাছে একটা আছে, রিজোলিউশন বেশি নয়, তবে—

মতিন চোখ কপালে তুলে বলল, আপনার কাছে আছে? আপনি কী করেন এটা

banglabook.com

দিয়ে?

সফদর আলী লাজুকভাবে একটু হেসে বললেন, তৈরি করেছিলাম অন্য কাজে, ভেবেছিলাম যদি সমুদ্রে যাই জেলে নৌকা করে, হঠাৎ হারিয়ে গেলে কাজে লাগবে। ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা একটু পাল্টে নিলেই ব্যবহার করা যাবে। যদি আমি—

আমাকে পুরোপুরি ভুলে গিয়ে দু'জনে খুব উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলতে থাকে, সফদর আলীর জিনিসটা কী ভাবে কাজ করে সেটাই আলোচ্য বিষয়। ফ্রিকোয়েন্সি, এফ. এম., এ. এম. মডুলেশান, ডিমডুলেশান, ট্র্যাকিং, ফিডব্যাক—এধরনের কথাবার্তা আলোচনা হতে থাকে। আমি চুপচাপ বসে বসে হাই তুলতে থাকি, দু'জনের কেউই ঘুরে পর্যন্ত তাকায় না। বসে বসে আমি অধৈর্য হয়ে উঠি আর আমার রাগটা ওঠে সফদর আলীর ওপর। এখন বসে বসে এসব নিয়ে কচকচি না করলে কী হত? বসে বসে বিরক্ত হতে হতে একসময়ে আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলতে শুরু করে। ঠিক করলাম সফদর আলীকে ভূতের ভয় দেখাতে হবে। বেড়াতে এসে যে ফ্রিকোয়েন্সি আর ফিডব্যাক নিয়ে কচকচ করতে থাকে, ভূতের ভয় দেখিয়েই তাকে উপযুক্ত সাজা দিতে হবে। কী ভাবে করা যায় সেটাও মনে মনে ছকে ফেললাম। ঘুমানোর আগে একটা দুটো ভূতের গল্প করব সফদর আলীর সাথে। গোরস্থানের গোর খুঁড়ে মৃতদেহ বের করার একটা গল্প আছে ভয়ানক। লাশকাটা ঘরেরও ক'টা গল্প জানি। ভীষণ ভয়ের সেটা। হোটেল সম্পর্কে কিছু আজগুবি জিনিস শুনিয়ে তাকে আগে থেকে নরম করে রাখা যাবে। রাতের বেলা কাউকে রাজি করাতে হবে সাদা চাদর জড়িয়ে হাজির হতে। সফদর আলীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একটা নাকিকান্না দিলেই হবে। সফদর আলীকে তাহলে আর দেখতে হবে না। ভয় পেয়ে তিনি তার ভূতটিপি টিপে টিপে কী অবস্থা করবেন চিন্তা করেই আমার হাসি পেয়ে যায়। বোধহয় সত্যি সত্যি হেসে ফেলেছিলাম। কারণ হঠাৎ দেখি সফদর আলী আর মতিন কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মতিন বলল, কী হল?

নাহ্, কিছু না। আমি অপ্রতিভভাবে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু হাসিটাতে মনে হল একটু কাজ হল, কারণ মতিন তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, সর্বনাশ, অনেক রাত হয়ে গেছে, তোরা তো ঘুমাবি! সারা দিন ট্রেনে-বাসে কষ্ট করে এসেছিস।

সফদর আলী কিছু বলার আগেই আমি তার কথাটি লুফে নিলাম, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিকই বলেছিস, শরীরটা জুত করতে পারছে না।

সফদর আলীর মনে হল এরকম জমাট বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বাধা পড়ল বলে একটু মনঃক্ষুণ্ন হলেন, কিন্তু আপত্তি না করে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। মতিন বলল, চল্ পৌঁছে দিয়ে আসি তোদের। এখানে আমাকে একটা ভাঙা জিপ দিয়েছে। জিপটা যদি স্টার্ট নেয়, তোদের তাহলে হেঁটে যেতে হবে না।

জিপটা বেশ সহজেই স্টার্ট নিল, দেখে মনে হল সফদর আলী যেন একটু হতাশ হলেন। যদি স্টার্ট না নিত তিনি হুড খুলে জিপের যন্ত্রপাতি একটু টেপাটেপি করার সুযোগ পেতেন। রওনা দেবার আগে মতিন জিজ্ঞেস করল, কোথায় উঠেছিস তোরা?

আমি হোটেলের নাম বলতেই মতিন বলল, তাই নাকি? আমরা সন্দেহজনক মানুষদের নামের যে লিস্ট বানিয়েছি, তোদের হোটেলের মালিকের নাম আছে তাতে।

banglabook.com

সে কী! আমি অবাক হয়ে বললাম, চমৎকার ভালো মানুষ এক জন, সে বেচারা কী দোষ করল?

কোনো দোষ করে নি, কিন্তু তবু খানিকটা সন্দেহ আছে। হেরোইন আজকাল নাকি ঢাকা এয়ারপোর্ট দিয়ে বিদেশি বাজারে চালান দেয়া হয়। তার মানে এই এলাকার কোনো লোক কাজকর্ম না করেই হঠাৎ করে বড়লোক হয়ে উঠছে কি না, ঢাকা যাচ্ছে কি না ঘন ঘন, এইসব রুটিন ব্যাপার আর কি। প্রায় জনা ত্রিশেক লোককে আমরা সন্দেহ করি, তার মাঝে তোদের হোটেলের মালিকও আছে।

খামোখা সন্দেহ করেছিস মনে হয়, আমি না বলে পারলাম না, চমৎকার ভালোমানুষের মতো চেহারা, কী সুন্দর ব্যবহার!

তোরা তো আছিস হোটেলে, দেখিস তো লোকটা সন্দেহজনক কিছু করে কি না। আবার বাড়াবাড়ি কিছু করিস না যেন।

কোনো ভয় নেই তোর, আমি মতিনকে সাহস দিই, পাকা ডিটেকটিভদের মতো কাজ করব আমরা।

সফদর আলী বললেন, ওর ঘড়িটা খুলে আমার মাইক্রোটাগমিটারটা ঢুকিয়ে দিতে পারলে—

মতিন বাধা দিয়ে বলল, না না না, সর্বনাশ! ওসব জিনিসের ধারে-কাছে যাবেন না, খবরদার!

সফদর আলীর একটু মন খারাপ হয়ে গেল বলে মনে হল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর আমার বেশ খানিকক্ষণ লাগল বুঝতে আমি কোথায়। নতুন জায়গায় ঘুমালে আমার সবসময় এরকম হয়। হঠাৎ মনে পড়ল আমি কোথায়, সাথে সাথে মনে পড়ল যে আমি ছুটি কাটাতে বেড়াতে এসেছি। অনেক বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু ওঠার কোনো তাড়া নেই, চিন্তা করেই আমার আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চায়, ভাবলাম আরো খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিই, কিন্তু আর ঘুম আসতে চাইল না। খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়লাম, পাশের বিছানাতে সফদর আলী কুণ্ডলী পাকিয়ে ছোট বাচ্চাদের মতো শুয়ে আছেন। তাঁকে না জাগিয়ে বাথরুমে গেলাম দাঁত মেজে গোসল ইত্যাদি সেরে ফেলতে। অনেক সময় নিয়ে সবকিছু শেষ করে যখন বের হয়ে এলাম, তখনো সফদর আলী ঘুমে। ঘড়িতে তখন দশটা বেজে যাচ্ছে। তাঁকে না জাগিয়ে আমি বেরিয়ে আসি, সামনে বিস্তীর্ণ সমুদ্র দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। হোটেলের সামনে একটা খুব আরামের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে আমাদের হোটেলের মালিক। তার হাতে দু'টি কবুতর, নিচে আরো কয়েকটি দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ভদ্রলোকের খুব পাখির শখ বলে মনে হয়। আমাকে দেখে ভালোমানুষের মতো হাসলেন, আমিও দাঁড়িয়ে ভদ্রতার একটা দুইটা কথা বললাম। মতিন বলেছিল, হোটেল মালিক সন্দেহজনক কিছু করে কি না দেখতে, কিন্তু এরকম নিরীহ গোবেচারা মানুষ সন্দেহজনক কী করতে পারে আমি বুঝে পেলাম না। আমি তবুও পাকা ডিটেকটিভের মতো সবকিছু সন্দেহের চোখে দেখতে থাকি, কবুতরগুলো পর্যন্ত বাদ গেল না।

বেশ খানিকক্ষণ গল্পগুজবে কেটে গেছে, হঠাৎ শুনি জিপের শব্দ। মতিন আসছে

banglabook.com

কি না দেখার জন্যে চোখ তুলে দেখি কটা জিপভর্তি পুলিশ দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। এদিকে গাড়ির যাতায়াত কম, তাই একটা কিছু গেলেই দশজন দাঁড়িয়ে দেখে, হোটেল মালিকও ঘাড় ঘুরিয়ে জিপটাকে দেখলেন। জিপটা কোথায় কেন যাচ্ছে বুঝতে আমার একটুও দেরি হল না। এখন হোটেল মালিককে চোখে-চোখে রাখলেই বুঝতে পারব সে সন্দেহজনক কিছু করছে কি না। সে যদি হেরোইন কারবারিদের এক জন হন, তাহলে তাঁকে এখন উঠে পড়তে হবে। ঘরের ভেতরে গোপন কোনো ওয়্যারলেসে খবর পাঠাতে হবে। পাকা ডিটেকটিভদের মতো আমি ঠিক করলাম তা হলে আমি কী করব, আমিও তাহলে সফদর আলীকে ডেকে তুলব ওয়্যারলেসের সংকেতটা ধরতে।

হোটেল মালিক জিপটাকে দূরে প্রায় অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকেন, আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। চোখে চোখ পড়তেই বললেন, পুলিশ মাঝে মাঝেই ওদিকে যায়, আরাকান থেকে ডাকাত আসে কি না কে জানে।

আমি বললাম, তাই নাকি?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বসে থাকেন। ওঠার কোনো লক্ষণ দেখালেন না। বসে বসে কবুতর নিয়ে খেলতে থাকেন। খুব শখের কবুতর নিশ্চয়ই।

প্রায় মিনিট পনের পার হয়ে গেল। ভদ্রলোক তবু চুপচাপ বসে রইলেন। হেরোইন কারবারি হলে এতক্ষণে উঠে যেতেন নিশ্চয়ই। হোটেল মালিক শুধু যে বসে আছেন তাই নয়, ওঠার জন্যে উসখুস পর্যন্ত করছেন না। কবুতর নিয়ে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে একসময়ে কবুতরগুলো উড়িয়ে দিয়ে আরামের চেয়ারটাতে আধশোয়া হয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকেন। হোটেলের এক জন কর্মচারী এসে একবার কোন-কোন রুমের বিছানার চাদর পাল্টাতে হবে জিজ্ঞেস করে গেল। ভদ্রলোক শুয়ে শুয়েই তার সাথে কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি উঠে একটু এদিক-সেদিক হেঁটে আসি। হোটেল মালিককে কিন্তু সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছিলাম। একসময় দেখি সফদর আলী বেশ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসছেন। আমার খোঁজেই সম্ভবত। সফদর আলী আমার কাছে এলে আমি তাকে পুরো ঘটনাটি বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে খুলে বললাম, একেবারে পাকা ডিটেকটিভদের মতো। সফদর আলীর উৎসাহ আমার থেকে বেশি। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরে গিয়ে তার সেই যন্ত্র বের করে এলেন। হোটেল মালিক চেয়ার থেকে উঠে ভেতরে গেলেই তিনি সেটা চালু করে দেবেন। এই হোটেল থেকে যদি খবর পাঠানো হয় তাহলে নাকি সেটা ধরে ফেলা পানির মতো সোজা। হোটেল মালিক কিন্তু উঠলেন না, মনে হল চেয়ারে বসে বসে একসময় যেন একটু ঘুমিয়েই পড়লেন।

আমাদের সকালে নাস্তা করা হয় নি, খিদে বেশ চাগিয়েই উঠেছে। কিন্তু ডিটেকটিভের এরকম একটা দায়িত্ব ছেড়ে তো যেতে পারি না। প্রায় দু'ঘন্টা পর হোটেল মালিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, সাথে সাথে আমরাও উঠে পড়ি। সফদর আলী গুলির মতো ঘরে চলে গেলেন, আমি হোটেল মালিকের পিছু পিছু। হোটেল মালিক ভেতরে ঢুকে কাউন্টারে বসে গুন-গুন করে কী একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাগজপত্র দেখতে থাকেন। সামনের সোফাতে সেদিনের খবরের কাগজ পড়ে ছিল আমি সেটা দেখার ভান করে তাঁকে লক্ষ করতে থাকি একেবারে পাকা ডিটেকটিভদের মতো।

প্রায় ঘন্টা তিনেক হোটেল মালিককে চোখে চোখে রেখে বুঝতে পারি যে খামাখা সময় নষ্ট হল। জীবনের প্রথম ডিটেকটিভ কাজের যে এরকম বৈচিত্র্যহীন একটা অভিজ্ঞতা হবে কে জানত। প্রচণ্ড খিদেয় তখন পেট চোঁ চোঁ করছে। সকালে নাস্তা পর্যন্ত হয় নি। আমার অবস্থা তবু ভালো হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিলাম, সফদর আলী বেচারা সেই যে ঘরে ঢুকে তার যন্ত্রপাতি খুলে কানে হেডফোন লাগিয়ে বসেছেন একবার ওঠেন নি পর্যন্ত।

আমরা দু'জনে ডিটেকটিভের কাজে ইস্তফা দিয়ে বের হলাম, প্রথমে কিছু একটা খেতে হবে তারপর মতিনকে খুঁজে বের করে রিপোর্ট দেওয়া। মনে মনে আশা করছিলাম হোটেল মালিককে বোকা বানিয়ে পুরো হেরোইন কারবারির দলটাকে হাতেনাতে ধরে ফেলব, খবরের কাগজে আমাদের ছবিটবি উঠে যাবে। কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ, হোটেল মালিক বেচারা নেহায়েতই নিরীহ গোবেচারা এক জন মানুষ।

মতিনকে তার বাসায় পাওয়া গেল না, ভোরবেলা নাকি বেরিয়ে গেছে। আমরা খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে বেড়াই। সফদর আলীর সাথে ঠিক কথাবার্তা বলা যাচ্ছে না। তিনি খুব অন্যমনস্ক। কী যেন খুব মন দিয়ে ভাবছেন। হুঁ-হাঁ করে উত্তর দেন। মাঝে মাঝে এমন একটি দুটি কথা বলেন, যার কোনো মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, ক'টা নাকি ক্যাং আছে খুব সুন্দর, যাবেন সেখানে?

সফদর আলী বললেন, হুঁ।

খুব চমৎকার নাকি একটা বৌদ্ধমূর্তি আছে সেখানে।

হ্যাঁ।

চলুন যাই, এদিক দিয়ে মাইলখানেক গেলেই নাকি পৌছে যাব।

হুঁ।

সময় আছে তো, কয়টা বাজে এখন?

হ্যাঁ।

সফদর সাহেব কয়টা বাজে এখন?

হুঁ।

গলা উঁচিয়ে আমাকে বলতেই হল, কয়টা বাজে এখন, আমার হাতে ঘড়ি নেই।

সফদর আলী থতমত খেয়ে বললেন, ও আচ্ছা! ছোট ট্রান্সমিটার তো ওভারলোডেড হয়ে যায়।

আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

রাতে যখন শোওয়ার ব্যবস্থা করছি তখন মতিন এসে হাজির। সকালবেলা খবর পেয়ে হেরোইন ল্যাবরেটরিতে হানা দিতে গিয়েছিল, কোনো লাভ হয় নি। ওরা যখন পৌছেছে তখন পুরো দল হাওয়া, এবারেও আগে থেকে খবর পেয়ে গেছে। আমরা আমাদের ডিটেকটিভ কাজের খবর দিলাম মতিনকে, পুলিশের জিপকে যেতে দেখে কী ভাবে সারাদিন হোটেল মালিককে চোখে-চোখে রেখেছি খুলে বললাম। শুনে মতিন খুশ হল কি না বোঝা গেল না। পুলিশে চাকরি করলে এই অসুবিধে, এক জন মানুষ নিরপরাধী শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়।

banglabook.com

তিনজন বসে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করি। আমার তখন আবার সফদর আলীকে ভয় দেখানোর কথাটা মনে পড়ে গেল। ভূতের ভয় দেখানোর জন্যে মতিনকে রাজি করানো যায় কি না ভাবলাম। কলেজে থাকতে ভারি পাজি ছিল! এখন হোমরাচোমরা মানুষ হয়ে ভদ্র হয়ে গেছে কি না কে জানে। মতিন যখন উঠে পড়ে আমি সফদর আলীকে বললাম, আপনি শুয়ে পড়ুন আমি মতিনকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

বাইরে এসে আমি মতিনকে ভূতের ভয় দেখানোর কথাটা বললাম, মাঝরাতে তাকে ভূত সেজে এসে সফদর আলীর পিলে চমকে দিতে হবে।

মতিন প্রথমে এককথাতে রাজি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তার আগের রাতের কথা মনে পড়ে যায়। সফদর আলীর স্টান্টগান থেকে কী ভয়ানক ইলেকট্রিক শক— সে সাথে সাথে পিছিয়ে যায়। আমি অনেক কষ্টে তাকে রাজি করালাম। কথা দিলাম আমি স্টান্টগানটা লুকিয়ে রাখব। এসব ব্যাপারে দেরি করে লাভ নেই আজ রাতেই করার ইচ্ছা, কিন্তু মতিনকে নাকি রাতে হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। কাজেই কখন সময় পাবে জানে না। ঠিক করা হল পরের রাতে সে আসবে। ঠিক একটার সময়। হাত দুটো উঁচু করা থাকবে পুরোটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। দেখে মনে হবে আট ফুট উঁচু একটা দানব। একবার সফদর আলীর বিছানার পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাবে, বাকি দায়িত্ব আমার।

ঘরে ফিরে এসে দেখি সফদর আলী কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে গেছেন।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি সফদর আলী তখনো ঘুমে। আমি বাথরুমে গোসল ইত্যাদি সেরে এসে দেখি সফদর আলী উঠে চিন্তিত মুখে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, আমরা ধরে রেখেছি খবরটা ওয়্যারলেসে যায়, কিন্তু আসলে হয়তো এটা পাঠানো হয় লেজার দিয়ে। খুবই তো সহজ। একটা ভালো আয়না, একটা ফটো ডায়োড একটা ভালো এমপ্লিফায়ার, ব্যাস তাহলেই হয়। সফদর আলী ভুরু কুঁচকে থেমে গেলেন তারপর গোঁফ টানতে টানতে বললেন, দিনের বেলা অবশ্যি মুশকিল— এতো আলোতে লেজার লাইটকে দেখা যাবে? কী মনে হয় আপনার?

আমি আর কী বলব? সফদর আলীকে ওভাবে চিন্তিত অবস্থায় বসিয়ে রেখে বের হয়ে এলাম। হোটেলের মালিক আজকেও অলস ভঙ্গিতে একটা ইজি চেয়ারে বসে আছেন। পায়ের কাছে কয়টা কবুতর, হাতের ওপর একটা। কবুতরগুলো মানুষকে ভয় পায় না, আজকে আমাকে দেখে একটা আমার হাতের ওপর এসে বসে। কয়টা দানা তুলে নিতেই খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে। হোটেলের মালিকের সাথে আরো একটা দুটো কথা হল। অলস প্রকৃতির লোক, বাইরে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে দেখি না।

সফদর আলী গোসল ইত্যাদি সেরে আসার পর দু'জন বেরিয়ে পড়লাম। সারাটা দিন ঘুরতে ঘুরতে কেটে গেল। অনেক মজার মজার জিনিস দেখার আছে। সব দেখে শেষ করতে পারব কি না সন্দেহ। শুধু মাছের বাজারগুলোই তো ভালো করে দেখতে একমাস লেগে যাবে। বিকেলের দিকে ক্লান্ত হয়ে আমরা ফিরে আসি। ঘরে ঢোকার আগে হঠাৎ ঝটপট করে উড়তে উড়তে হোটেল মালিকের একটা কবুতর নেমে এসে একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে বসে। আজ সকালেই এটাকে দানা খাইয়েছি, একদিনেই আমাকে চিনে গেছে। আমি কবুতরটার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম—সফদর সাহেব হঠাৎ বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।

banglabook.com

কবুতরটিকে তিনি সাবধান হাতে নেন, তখন আমার চোখে পড়ে কবুতরের একটা পায়ে কী সব জিনিস বাঁধা। সফদর সাহেব সেগুলো খুলতে খুলতে বললেন, বোকা কবুতরটা মানুষকে ভয় পায় না, যার কাছে ইচ্ছা চলে যায়। নিশ্চয়ই দুষ্টু কোনো ছেলের হাতে পড়েছিল, দেখেন পায়ে কী সব বেঁধে দিয়েছে।

দুষ্টু ছেলের কাজ! পায়ে ছেঁড়া কাগজ, একটা শিশি, শিশিতে সাবানের গুঁড়া না কী শক্ত করে বাঁধা! আমরা সাবধানে সবকিছু খুলে কবুতরটিকে উড়িয়ে দিই।

রাতে রেস্তরা থেকে খেয়ে আমরা সকাল সকাল ফিরে আসি। আজ রাতে সফদর আলীকে ভূতের ভয় দেখানোর কথা। আগে থেকে একটা ভৌতিক আবহাওয়া তৈরি করতে হবে। হোটেলে ঢোকার সময় হোটেল মালিকের সাথে দেখা, দেখে মনে হল ভদ্রলোক কিছু একটা নিয়ে যেন একটু দুশ্চিন্তিত, আমাদের দেখে একটু হাসির ভঙ্গি করলেন। আমি বললাম, আপনার কবুতরগুলো খুব পোষ মেনেছে, মানুষকে মোটে ভয় পায় না।

হোটেল মালিক যে একটু শঙ্কিতভাবে আমাদের দিকে তাকাল, একটু আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, একটু বেশিই পোষ মেনেছে।

আজ বিকেলে উড়ে একেবারে আমার ঘাড়ে এসে বসেছে।

বিরক্ত করে নি তো আবার?

না, না বিরক্ত কীসের।

সফদর আলী বললেন, আমার মনে হয় আপনার কবুতরকে একটু ট্রেনিং দেওয়া দরকার।

হোটেল মালিক ভুরু কুঁচকে বললেন, কীসের ট্রেনিং?

এই যেন অপরিচিত মানুষের কাছে না যায়। আজ বিকেলে দেখি কে যেন দুষ্টুমি করে পায়ে কী সব বেঁধে দিয়েছে।

হোটেল মালিক হঠাৎ যেন একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। সফদর আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমরা খুলে দিয়েছি, আপনার কবুতরের কিছু হয় নি। চমৎকার উড়ে গেল তখন।

আমরা ঘরে ফিরে এলাম, হোটেল মালিক পিছু পিছু এলেন। ধন্যবাদ জানাতে নিশ্চয়ই। কিছু-একটা বলবেন বলবেন করেও যেন ঠিক বলতে পারলেন না।

ঘরে ঢুকেই আমি ভূতের ভয় দেখানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিই। নিরীহ স্বরে সফদর আলীকে বললাম, হোটেলটা বেশ বড়, কিন্তু মানুষজন কত কম দেখেছেন?

সফদর আলী বললেন, ঠিক করে পাবলিসিটি করে না। নিওন লাইট দিয়ে লিখে দিত—

বাধা দিয়ে বললাম, আপনার তাই মনে হয়? আজ বাজারে এক জনের সাথে কথা বলছিলাম, সে অন্য কথা বলল।

কি বলল?

বলল বছর দুই আগে নাকি কে এক জন আত্মহত্যা করেছিল এই হোটেলে। সেই থেকে গভীর রাতে কে নাকি হেঁটে বেড়ায়। ভরা পূর্ণিমা হলে নাকি কান্নার আওয়াজ শোনা যায়।

সফদর আলীর মুখ ফ্যাকাসে মেরে যায়, আমি হালকা গলায় বললাম, লোকজন

banglabook.com

যে কি বাজে কথা বলতে পারে! শুধু শুধু এরকম একটা চমৎকার জায়গার এরকম বাজে একটা বদনাম।

আবহাওয়াটা এর মাঝে ভৌতিক হয়ে গেছে, আমি তার মাঝে আরো একটা দাগা ছেড়ে দিলাম, বললাম, ভূতের ভয় পেলেই ভয়। আমার সেরকম ভয়টয় নেই। তবে হ্যাঁ, আমার এক মামা ভয় পেতেন কিছু বটে! অবশ্যি তার কারণও ছিল।

সফদর আলী দুর্বল গলায় বললেন, কি কারণ?

আমি অনেক দিন আগে পড়া একটা ভূতের গল্প মামার গল্প হিসেবে চালিয়ে দিলাম; ভূতের গল্প সবসময় নিজের পরিচিত মানুষের গল্প হিসেবে বলতে হয়, এ ছাড়া ঠিক কাজ করে না। ভেবেছিলাম দুটি গল্প লাগবে, দেখলাম এক গল্পেই কাজ হয়ে গেল। ঘরে লাগানো বাথরুম, সেখানে যাওয়ার সময় সফদর আলী বললেন, ইকবাল সাহেব, দরজার কাছে দাঁড়াবেন একটু, আমি বাথরুম থেকে আসি।

বিছানায় শুয়ে বাতি নেভানোর পর আমি আমার দ্বিতীয় গল্পটি ফেঁদে বসি। এটাও এক ইংরেজি বইয়ে পড়েছিলাম; স্থান, কাল, পাত্র একটু বদলে আমার দূর সম্পর্কের এক চাচার নিজের জীবনের ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দিতে হল। লাশকাটা ঘরে একটা খুন হয়ে যাওয়া মানুষের গল্প, বীভৎস ঘটনা বলতে গিয়ে আমার নিজেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সফদর আলীর কথা ছেড়েই দিলাম। মতিন যখন ভূত সেজে আসবে, তখন বাড়াবাড়ি কিছু না একটা হয়ে যায়, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে থাকে। দরজাটা খুলে রেখেছি, রাত একটার সময় আসার কথা, গল্পে গল্পে বেশ রাত হয়ে গেছে, আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না।

একটু তন্দ্রামতো এসেছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, জানালাটা কেউ বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা করছে। মতিন এসে গেছে, দরজা খোলা রাখব বলেছিলাম, নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। আমি সফদর আলীকে জাগাব ভাবছিলাম, তার আগেই সফদর আলীর ভাঙা গলা শুনতে পেলাম, ভয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। কোনোমতে ফিসফিস করে বললেন, ইকবাল সাহেব, কি কি যেন ঘরে ঢুকছে—

আমি বললাম, চুপ, একটা কথাও না।

মতিন জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। বলেছিলাম, দু'হাত উঁচু করে সাদা কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিতে, কিন্তু মতিন বোকার মতো একটা কাল কাপড় পরে এসেছে, হাত দু'টি তো উঁচু করেই নি, বরং চোরের মতো আস্তে আস্তে পা ফেলে ইতিউতি করে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকে। তাই দেখেই সফদর আলীর প্রায় হার্টফেল করার মতো অবস্থা। হাতড়ে হাতড়ে কোনোমতে ভূতটিপিটা বের করে টিপে দিলেন, সাথে সাথে উচ্চস্বরে আয়াতুল কুরসি পড়া শুরু হয়ে যায়।

মতিন বেচারা গেল ঘাবড়ে। ভীষণ চমকে ওঠে। তারপর দরজার দিকে ছুটে যায় গুলির মতো, কোনোমতে দরজা খুলে এক দৌড়।

হাসির চোটে আমার প্রায় দম বন্ধ হবার মতো অবস্থা। ঘরে আলো জ্বালিয়ে সফদর আলীর সাহস ফিরিয়ে আনি। তাঁর গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না, ভূতটিপিটা আঁকড়ে ধরে, দুই পা তুলে বিছানায় উবু হয়ে বসে আছেন। তিনি সে রাতে আর আলো নেভাতে দিলেন না, বিছানায় জবুথবু হয়ে বসে রইলেন।

banglabook.com

পরদিন সফদর আলীকে চেনা যায় না, চোখ বসে গিয়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দেখে মনে হয় এক রাতে বয়স দশ বছর বেড়ে গিয়েছে। আমার তখন খারাপ লাগতে থাকে, ভীতু মানুষ, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও হত।

সফদর আলী উঠেই তাঁর ভ্রমণবন্দি গোছাতে শুরু করলেন, এই হোটেলে তিনি আর থাকবেন না। ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আমাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে হল। ভাবছিলাম শুনে বুঝি সফদর আলী খুব রাগ করবেন, কিন্তু উল্টো এত খুশি হয়ে উঠলেন যে বলার নয়। ভূতটুত কিছু নয়, আমি আর মতিন মিলে তাঁকে ভয় দেখিয়েছি ব্যাপারটা তাঁর কাছে এত মজার একটা ঘটনা মনে হতে থাকে যে, আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। পেট চেপে ধরে তিনি দুলে দুলে হাসতে থাকেন, আর একটু পরপর বলতে থাকেন, আপনারা তো সাংঘাতিক মানুষ! হিঃ হিঃ হিঃ, আমি আরো ভাবলাম সত্যিকার ভূত, হিঃ হিঃ হিঃ! মতিন সাহেবকে দেখলে মনে হয় কত বড় অফিসার, আর সে কিনা—হিঃ হিঃ হিঃ—সফদর আলী তাঁর কথা শেষ করতে পারেন না।

ব্যাপারটা এত সহজে চুকে গেল দেখে আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। সফদর আলী সহজ-সরল মানুষ বলে এত সহজভাবে নিয়েছেন, অন্য কেউ হলে চটে যেত নিঃসন্দেহে। কয়জন মানুষ নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা সহ্য করতে পারে? দু'জনে হালকা মন নিয়ে বের হই। আজকেও হোটেল মালিক ইজিচেয়ারে বসে আছেন। কবুতরগুলো পায়ের কাছে বসে দানা খাচ্ছে। আমাদের বের হতে দেখে কেমন জানি বাঁকা করে তাকিয়ে না দেখার ভান করে সামনে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, ভদ্রলোকের হয়তো কথা বলার ইচ্ছে নেই, আমরা তাঁকে আর ঘাঁটালাম না।

নাস্তা করে ভাবলাম জেলেপল্লী থেকে ঘুরে আসি। জেলেনৌকা করে সফদর আলীর সমুদ্রে যাবার শখ। ব্যাপারটা আলোচনা করে আসবেন। পথে মতিনের বাসা, ভবলাম একটু দেখা করে যাই। তাকে দেখে গত রাতে সফদর আলী কেমন ভয় পেলেন নিশ্চয়ই জানতে চাইছে। দরজায় টোকা দেয়ার আগেই দরজা খুলে গেল, দেখি মতিন প্রায় ছুটে বেরিয়ে আসছে। আমাদের দেখে থতমত খেয়ে বলল, তোরা এসেছিস? আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। গলা নামিয়ে বলল, খবর এসেছে আবার, আজ নাকি অনেক বড় দল। রাতে আসব তোদের ওখানে।

সফদর আলী ভূতসংক্রান্ত কী একটা বলতে চাইছিলেন, মতিন তার আগেই আমাকে টেনে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, কাল রাতে হঠাৎ হেড অফিস থেকে ফোন, তাই আর সফদর সাহেবকে ভয় দেখানোর জন্যে যেতে পারি নি। আজ যাব। তুই আবার অপেক্ষা করে ছিলি না তো?

আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল, কিছু বলার আগেই মতিন বলল, এক্ষুনি যেতে হবে, গেলাম আমি।

সফদর আলী এগিয়ে এসে বললেন, কী বললেন মতিন সাহেব?

আমি দুর্বল গলায় বললাম, বলল আজ রাতে সে ভূত সেজে আসবে।

আবার?

না, আবার না, গত রাতে ব্যস্ত ছিল, তাই আসতে পারে নি।

banglabook.com

সফদর আলীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, ঢোক গিলে কোনোমতে বললেন, তার মানে গত রাতে সত্যি ভূত এসেছিল। সর্বনাশ!

আমরা যখন জেলেপল্লীর দিকে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সবকিছুর মূলে রয়েছে আমাদের হোটেল মালিক আর কবুতর। যখন হেরোইন ল্যাবরেটরিতে কাজ চলে, তিনি তাঁর হোটেলের সামনে কবুতর নিয়ে বসে থাকেন, যখন দেখেন পুলিশ যাচ্ছে, তিনি তাঁর কবুতর উড়িয়ে দেন। ট্রেনিং দেয়া কবুতর উড়ে গিয়ে হাজির হয় হেরোইন ল্যাবরেটরিতে। সেখানকার লোকজন দেখেই বুঝে যায় পুলিশ আসছে, তারা সবকিছু গুটিয়ে পালিয়ে যায় নিরাপদ জায়গায়। হেরোইন ল্যাবরেটরির লোকজন যখন হোটেলের মালিকের কাছে কোনো খবর পাঠাতে চায়, তারা কাগজে লিখে কবুতরের পায়ে বেঁধে উড়িয়ে দেয়। কবুতর সেটা নিয়ে আসে হোটেল মালিকের কাছে। গতকাল আমরা কবুতরের পা থেকে যেটা খুলে ফেলেছিলাম, সেটা ছিল ওদের পাঠানো কোনো জরুরি খবর। ছোট শিশিতে নিশ্চয়ই কিছু হেরোইন ছিল, বানানো জিনিসটার একটু নমুনা। কাল সেজন্যেই হোটেল মালিক আমাদের মুখে তাঁর কবুতরের গল্প শুনে এত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। রাতে সেজন্যেই হোটেল মালিক এসেছিল আমাদের ঘরে, তাঁর সেই হেরোইনের শিশি উদ্ধার করার জন্যে। সফদর আলীর ভূতটিপি যখন উচ্চৈস্বরে আয়াতুল কুরসী পড়তে শুরু করেছে, তিনি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছেন।

সফদর আলীকে পুরোটা বোঝাতে একটু সময় লাগল। তিনি ভাবলেন, আমি বলতে চাইছি হোটেল মালিকের কবুতরগুলো আসলে যান্ত্রিক কবুতর, ভেতরে যন্ত্রপাতি দিয়ে বোঝাই। হোটেল মালিক সুইচ টিপে দিয়ে কবুতরগুলো উড়িয়ে দেন, সেগুলো তখন খবর নিয়ে যায় হেরোইন ল্যাবরেটরিতে। এরকম কবুতর বানানো কঠিন বলে তিনি আপত্তি করে যাচ্ছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন আমি বলতে চাইছি কবুতরগুলো সাধারণ দেশি কবুতর এবং এগুলো দিয়েই খবর পাঠানো হয়, সফদর আলী হঠাৎ করে সবকিছু বুঝে গেলেন। খাঁটি ডিটেকটিভদের মতো আমরা সাথে সাথে বুঝে গেলাম আমাদের কি করতে হবে, মতিন তার দলবল নিয়ে রওনা দেবার আগে আমাদের গিয়ে কবুতরগুলোকে আটকাতে হবে।

দু'জনে প্রায় ছুটতে ছুটতে হাজির হলাম হোটেলে। হোটেল মালিক অলসভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, পায়ের কাছে কবুতরগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি সহজ ভঙ্গি করে হোটেল মালিকের কাছে গিয়ে বসি, তখনো অল্প অল্প হাঁপাচ্ছি। সফদর আলী চলে গেলেন কী একটা জিনিস আনতে।

হোটেল মালিক আমাকে বললেন, কি ব্যাপার, একেবারে হাঁপাচ্ছেন দেখি?

কিছু একটা কৈফিয়ত দিতে হয়, যেটা মাথায় এল সেটাই বলে ফেললাম, কোনোরকম ব্যায়াম হচ্ছে না, তাই ভাবলাম একটু দৌড়াই। সকালে দৌড়ানো স্বাস্থ্যের জন্যে খুব ভালো কিনা!

ও!

কবুতরগুলোকে কী ভাবে আটকানো যায় তাই ভাবছিলাম। একটু করে পাখা ছেঁটে দিলে হয়। কিন্তু এত কাছে বসে করি কী করে? এমন সময় সফদর আলী বের

banglabook.com

হয়ে এলেন, হাত দেখিয়ে একটা ভঙ্গি করলেন, যার অর্থ তিনি সবকিছু ঠিক করে নিয়েছেন। আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এসব ব্যাপারে সফদর আলীর উপর আমার বিশ্বাস আছে।

সফদর আলী এসে আমার পাশে বালুর উপর পা ছড়িয়ে বসলেন, হোটেল মালিক তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ভদ্রতার কী একটা কথা বললেন। উত্তরে সফদর আলীও কিছু–একটা বলে একটা কবুতরকে আদর করার ভঙ্গিতে তুলে নেন। হোটেল মালিক একটু অন্যদিকে তাকাতেই আঙুলের মাথায় লাগানো কালোমতো ছোট একটা জিনিস কবুতরটার মাথায় টিপে লাগিয়ে দেন। জিনিসটা আঁটালো, মাথার পালকের নিচে ভালোভাবে লেগে যায়, কবুতরটা কোনো আপত্তি করল না, দেখেও বোঝার উপায় নেই।

চারটা কবুতর। হোটেল মালিক কোনটা ব্যবহার করবেন জানি না। তাই একটি একটি করে চারটার মাথাতেই সফদর আলী সেই কালোমতো জিনিসগুলো টিপে লাগিয়ে দিলেন। সেটা কী জিনিস জানি না, কী ভাবে কাজ করবে তাও জানি না, কিন্তু সফদর আলীর উপরে আমার বিশ্বাস আছে। তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবে বের করেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তাকিয়ে দেখি একটা জিপ–বোঝাই পুলিশ যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। সামনের সিটে মতিনকেও দেখতে পেলাম, সাদা পোশাকে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

জিপটা চলে যেতেই হোটেল মালিক সাদা রঙের একটা কবুতর বাম হাতে তুলে নিলেন। তারপর অন্যমনস্ক ভঙ্গি করে ডান হাত দিয়ে কবুতরের সামনে তিন বার চুটকি বাজালেন। নিশ্চয়ই এটা কোনোরকম একটা সংকেত। সত্যি তাই, কবুতরটি তিনটি চুটকি শুনেই হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যায়, প্রথমে সোজা উপরে, তারপর ঘুরে দক্ষিণ দিকে। সাংঘাতিক উড়তে পারে পাখিটা, দেখতে দেখতে সেটা মিলিয়ে গেল।

আমরা তিন জনেই তাকিয়ে ছিলাম কবুতরটার দিকে। সফদর আলী অন্যমনস্কভাবে বললেন, খুব ভালো উড়তে পারে কবুতর।

হোটেল মালিক অন্য কবুতরগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, কবুতরের অনেক গুণ।

হ্যাঁ, খেতেও খুব ভালো, আমি যোগ না করে পারলাম না, ভুনা কবুতরের মাংস, খিচুড়ির সাথে গরম ঘি দিয়ে খেতে দারুণ লাগে।

হোটেল মালিক এবং সফদর আলী, দু'জনেই আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন। আমার কথাবার্তায় প্রায় সময়েই খাবারের বিষয় এসে পড়ে। সফদর আলী একটু থেমে বললেন, কবুতরের দিকজ্ঞান খুব ভালো। কখনো রাস্তা হারায় না। যুদ্ধের সময় কবুতর দিয়ে শত্রু অঞ্চল থেকে খবর পাঠানো হত।

হোটেল মালিক অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বসলেন। সফদর আলী না দেখার ভান করে বললেন, অনেকদিন বিজ্ঞানীরা জানতেন না কবুতর কী করে দিক ঠিক রাখে। দিন হোক রাত হোক কিছু অসুবিধে হয় না।

হোটেল মালিক একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন জেনেছে?

খানিকটা।